অচিন পাখি

কবি চক্রবর্তী

কুমারগঞ্জ গ্রামের নদী তীর বরাবর একটি পাড়া বারুণীতলা। সবাই বলে বান্যিতলা। এই বারুণীতলার পাশে বেশ কটি ঘর শরীরে শরীর লাগিয়ে। মল্লিক পাড়া। তপশীল জাতির এই মানুষ গুলো একদিন এখানে এসে বসত গড়েছিল। শোনা যায়, কোনো এক জোতদার এদের কয়েক জনকে এনেছিল বাড়ির কাজের জন্য। এনেছিল বর্ধমান থেকে। যদিও তার শেকড় আজ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। কারণ সে সব মানুষ আজ অতীত।

কেউ কেউ বলে মাল। মল্লিকের রূপান্তর। এদেরই একজন সাধু মল্লিক। এদের কথা বলার মধ্যে সুন্দর টান। পরঘরে দিন মজুরি এদের কাজ। দু-একজন খাস জমি পত্তনি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। তবে সংখ্যায় অতি নগন্য। সাধু তার পরিবার নিয়ে কাজ কর্মে দিন গুজরান করে।

বয়স বাড়ে। কর্মক্ষমতা ক্রমশ কমে। গৃহকর্মের কিছু নিপুণতা থাকায় সাধুর ডাক পড়ে। কিন্তু কী এক অদৃশ্য কারণে বা বাইরের টানে সাধু একদিন নিরুদ্দেশে। সাধু ঘরণি তিন-চারটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান নিয়ে অথৈ জলে।

সে সময়ে আজকের মতো বারোমাস মাঠের কাজ নেই। একটি ফসল। আমন চাষ। ফলে সুখ পাখিটা অল্প কয়েক দিনেই ফুড়ুৎ। শুরু হয় দুঃখের বারোমাস্যা। খাওয়া-না খাওয়া দিন। এভাবে দিন গড়িয়ে মাস। মাস গড়িয়ে বছর।

গড়াতে কয়েকটা বছর পেরিয়ে গেছে। সাধু মালের কথা ভুলতে বসছে পাড়ার মানুষরা। পরিবারে সাধু নামে মানুষটির ওপরেও বিস্মৃতির পরত। যদিও সাধু ঘরণি শশীবালা নৌকায় যাত্রীরা পারাপার করে। শশীবালা অপর পাড় থেকে আসা যাত্রীর মাঝে খোঁজে চেনা মানুষটাকে। তাকানোর ভেতর অবচেতনায় নামে ধারা। কী মনে হতেই ঝপাঝপ কয়েকটি ডুব দিয়ে ফেরে ঘরে। ভেজা বাসন ছাড়ে। বেড়ার বাতায় গোঁজা আয়নার টুকরে দেখে সিঁথিতে সিঁদুর দিতে ভোলে না।

চলার মধ্যে ছানারা কখন জোয়ান হয়। সাধু অবশ্য নিরুদ্দেশে যাবার আগে বড় কন্যাটিকে বিয়ে দিয়ে গেছে। তার জন্য ঘরের পেছনে একমাত্র সম্বল দশ কাঠা ভিটে জমিটাকে টাকার বিনিময়ে বাঁধা রেখে গেছে। রেখেছে সুবল পাহানের কাছে। টাকা পরিশোধ করলেই জমি ফেরৎ। সুবল সে জমিতে সবজি ফলায়।

তুলসি মঞ্চের সন্ধ্যা দীপটি যেমন জ্বলতে জ্বলতে নেভে। সাধুর ফেরাও শশীবালার মন মুকুর থেকে ধীরে ধীরে মুছে যায়। কখনও মন মুকুরে ঢেউ ওঠে, আবার তা ভেঙে টুকরো টুকরো ছড়িয়ে পড়ে।

চৈত্র মাসের দিন। তীব্র উত্তাপ। পশ্চিমের হাওয়ায় গরম স্রোত। এ সময় নদীর জল তলানিতে। কোথাও পায়ের গোছা ডোবা, কোথাও বা হাঁটু জল। বাঁশের মাচা দিয়ে পেরোলে পয়সা লাগে। গরীবগুর্বরা জল ভেঙে নদী পেরোয়।

কাঁচা পাকা দাড়ি চুল। গেরুয়া বসন। কাঁধে ঝোলা। এক হাতে চিমটা। অন্যহাতে কমন্ডলু। প্রতি পদক্ষেপে হাতের চিমটার রিং-এ ঝুম ঝুম শব্দ। হঠাৎ করে দেখলে ভিনদেশি কোন সাধু সন্ত বলেই ভ্রম হয়। মানুষটি বারুণীতলা পেরিয়ে ঘরের কাছে এসে দাঁড়ায়। বেড়া দিয়ে ঘেরা ঘরটির জীর্ণদশা। তবে আঙিনা টুকু লালমাটি দিয়ে মোছা। পাশে তুলসি মঞ্চটা আবশ্য একই জায়গায় আছে।

মানুষটি আর কেউ নয়। নিরুদ্দিষ্ট সাধুচরণ। আঙিনায় দাঁড়িয়ে চার দিকে তাকায়। খানিক চুপচাপ। দীর্ঘশ্বাস চেপে ডাকে কোথা গেলিরে বউ।

বেলায় ঢল নেমেছে। শশীবালা সারাদিনের কাজ মিটিয়ে চান সেরে চারটি ভাত ফুটিয়ে খেতে বসেছে। হাতে তোলা গ্রাস মুখের কাছে থেমে যায়। ডাকটা বড় চেনা। মুখের গ্রাস হাত থেকে খসে পড়ে পাতায়। এঁটো হাতে বাইরে আসে-কে বটে?

দাড়ি গোঁফের ফাঁক থেকে ম্লান হাসি ফোটে-কী রে বউ চিনতে পারছিস নাই বটে!

-হাঁ বটে। বিস্মিত শশীবালা। -এ্যাত্তো দিন কুথাকে গিয়েছিলে?

শশীবালার কন্ঠে অভিমান।

সাধু ঝোলা, চিমটা, কমন্ডলু তুলসি তলায় নামিয়ে রেখে বলে-বুলবো, সব বুলবো। আগে তো দমটা লিতে দে।

পশ্চিমের হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে সাধু মালের ঘরে ফেরার খবর ছড়িয়ে পড়ল গ্রামের আনাচ কানাচে। দেখতে দেখতে ছোট্ট আঙিনাটুকু নানা বয়সি মানুষে পূর্ণ। সাধু আজ সত্যিকারের সাধু। নানা প্রশ্ন, নানা জিজ্ঞাসা। সাধু কখনো তার জবাব দেয় –কখনো স্মিত হাসি দিয়ে বোঝায় মানেটা এমন, তোমরা বুঝে নাও।

গ্রামে কিছু মানুষ থাকে, যাদের চাহিদার বিস্তার অনেকটা লম্বা। অল্পতে তারা খুশি নয়। তারা নানা ভাবে সাধুকে উত্যক্ত করে। আশ্চর্য, আগের সাধু আর আজকের সাধুতে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। আজ সে ধরা চূড়ার অনেক ওপরে। স্বাভাবিক, অতি উৎসাহে-ভাটা আসে। মানুষ ফিরে যায় নিজের স্রোতে।

সাধুর সংসার আজ দুটি মানুষের। ছানা-পোনার পাখা গজিয়ে উড়াল দিয়েছে। কয়েক বছরের বাঁধন ছেঁড়া জীবন, সাধুকে শিখিয়েছে নতুন জীবনকথা।

ঘরের পাশে ছোট এক মন্দির রাধা কৃষ্ণের। সকালে নদী জলে চান সেরে পুজোপাট। তারপরই পথ থেকে পথে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। হাতে একতারা। একতারার তারে সুর। সাদুর গলায় গান- 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, ক্যামনে আসে যায়।' সে গান আর সুরের দ্বৈরথে-অ-সুরের জন্ম হয়। যদিও সাধুর কোনো হেলদোল নেই। সঙ্গে ডালা কাঁখে শশীবালা। মাঝে মধ্যে সেও দোহার ধরে। ফল আরো মারাত্মক। সুর এবার ত্রি-স্রোতা।

সাধুর দিনযাপন এখন মাধুকরিতে। যা পাওয়া যায় কৃষ্ণসেবা এবং নিজসেবা বেশ চলে যায়। সন্ধ্যায় বসে কীর্তন আসর। কীর্তন যত না, তা চাইতে গঞ্জিকার সরস গন্ধে মাতোয়ারা বাতাবরণ। প্রদীপ শিখায় যেমন পতঙ্গ ধায়, তেমনই গাঁজা গন্ধে উড়ে আসে নানা বয়সি রস পিপাসুরা। বাড়িটা সরগরম।

হঠাৎ সাধুর চলমান জীবনে ছেদ আনল সুবল পাহান। পাওনা টাকা পরিশোধ কর নতুবা জমিটা রেজিস্ট্রি করে দাও। বর্তমান জীবন যাত্রায় সাধুর পক্ষে সে অর্থ এতকাল বাদে পরিশোধ করা সম্ভব নয়। অতএব জমি রেজিস্ট্রি করাই একমাত্র পথ।

দিনক্ষণ ঠিক হয়। যথা সময়ে ভেন্ডারের কাছে দলিল লেখা হবার পর, ভেন্ডার সাধুকে সব বুঝিয়ে দেয়। রেজিস্ট্রি অফিসে সাক্ষীর সই বাবুদ শেষে দলিল জমা হয়। অপেক্ষা, রেজিস্টার এলেই পরবর্তী কাজ।

অফিসের বাইরে বহু মানুষের জটলা। ভেন্ডাররা তৎপর। কিভাবে নিজের কাজটা আগে করা যায়। কোন পদ্ধতিতে নীচের দলিল ওপরে উঠে আসে। ফলে বাক্ বিতন্ডা। সকলেই চায় একবার কাঠ গড়ায় পার্টিকে তুলে দিতে পারলেই আবার সেরেস্তায় নতুন খদ্দের ধরা।

ডাক পড়ে সাধুরচরণ মল্লিক।

সুবল সাধুকে প্রায় চ্যাংদোলা করে দরজা দিয়ে ভিতরে ঠেলে দেয়।

ধীর পায়ে সাধু কাঠগড়ায় দাঁড়ায়। রেজিস্টার সাধুকে ঠান্ডা দৃষ্টিতে দেখে। খানিক সময় যায়। রেজিস্টার জিজ্ঞাসা করে দলিল তোমার?

সাধু মাথা নাড়ে।

-টাকা পেয়েছো?

একই পদ্ধতিতে জবাব।

-কী জন্য জমি বিক্রি করছো?

-বিটিটার বিহা দিয়েছি বাবু।

-তোমার নাম কী?

-আজ্ঞে সাধু।

-সম্পূর্ণ নাম বলো?

-সাধু।

বিরক্ত রেজিস্টার-সাধু তো সংসারে কেন? পাহাড়ে যাও।

সাধু উত্তরে মাথা নাড়ে।

-আরে বাবা, তোমার বাপের দেওয়া নামটা বলো?

-বইলেছি তো ছার, সাধু।

-বুঝলাম, তোমার পারিশ কী?

-সাধু চরণ

-বেশ, বেশ। এবার টাইটেল বলো

-আজ্ঞে সাধু।

ক্ষিপ্ত রেজিস্টার দলিল ছুঁড়ে ফেলে। এ জমি রেজিস্ট্রি হবে না। -নেকস্ট।

এদিকে সুবল পাহান লাফাচ্ছে। নির্বিকার সাধু বাইরে আসা মাত্র বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে ধরে শালা মাল, শালা তুই সাধু ন চর (চোর) রে। ভেন্ডারও অবাক। উপস্থিত সকলে অবাক চোখে সাধুকে দেখে। কেবল সাধুর কোনো পরিবর্তন নেই।